

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য সেই প্রাচীনকাল থেকে বিবর্তনকেই করেছিল তার একমাত্র সঙ্গী। ভাষা, বিষয়, চরিত্র, রচনারীতির নানান আঙ্গিক তাকে ভরিয়ে তুলেছিল বৈচিত্র্যের সম্ভারে। চর্যার ভাষা থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হয়ে এক নতুন ভাষা আমরা পেয়েছিলাম মঙ্গলকাব্য এবং পদাবলী সাহিত্যে। বিষয়গত পরিবর্তন তো অবশ্যই ঘটেছিল, সেই সঙ্গে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের ভঙ্গিও বদলেছিল বটে। এরপর আধুনিক যুগে গদ্যভাষার সূচনা হল, মানুষ দেবতার প্রভাব ছেড়ে বেরিয়ে এলেন সমাজ জীবনের কথাকার হয়ে। রচিত হল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও জীবন সংগ্রামের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে প্রথম বাংলা ভাষার সার্থক উপন্যাস রচিত হল। তিনি বাঙালিকে এক নতুন ভাষার সঙ্গে পরিচয় করালেন। গুরুগম্ভীর, সমাসবদ্ধ, সংস্কৃত মণ্ডিত এক বাংলা ভাষা, তবে সহজবোধ্য। বঙ্কিমী-ভাষার এই জাল ভেদ করে যিনি কথাসাহিত্যের এক নতুন ভাষা নির্মাণ করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাহিনি গ্রন্থনা যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন ভাবপ্রকাশ ও ভাষার ব্যবহার। প্রথমে সাধু ভাষায় এবং পরে চলিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথ যে কথাসাহিত্যের সৃষ্টি করলেন তা-ই প্রবাহিত থাকলো একের পর এক কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে। বিষয়ের পরিবর্তন বা নতুনত্ব এলেও ভাষার পরিবর্তন আমরা সেভাবে লক্ষ করলাম না, যতদিন না কমলকুমার তাঁর ভাষার বৈচিত্র্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সূচনা করলেন।

কমলকুমারের জীবন বৈচিত্র্যময়। ছবি আঁকা, অঙ্কন শিক্ষক হিসেবে নিজের দক্ষতা প্রকাশ, কাঠের কাজ, কাটুমকুটুম, নাটক পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা, তথ্যচিত্র নির্মাণ ইত্যাদির পাশাপাশি সরকারের জনগণনা বিভাগে, গ্রামীণ শিল্প-কারুশিল্প বিভাগে, কখনো বা ললিতকলা বিভাগে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ষাটের দশকের এক অন্যতম গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে নিজের একটি স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তবুও তিনি ব্রাত্য হয়েই রয়ে গেলেন বাংলা সাহিত্য-সমাজে। খ্যাতনামা সমালোচকেরা শুধুই তাঁর ভাষার দুর্বোধ্যতা নিয়ে আলোচনা করে যেন খানিক তাঁকে এড়িয়ে গেলেন। তাঁর

রচনায় দীর্ঘ বাক্য, বাক্যগঠনের ভিন্নতা, যতিহীনতাই তাঁদের আলোচনায় মুখ্য হয়ে উঠলো। কখনো শুধুমাত্র একটি উপন্যাস বা দুটি গল্পের সমালোচনাতেই কমলকুমার নামক অধ্যায়ে ইতি টানলেন তাঁরা। এমনকি কেউ কেউ তো তাঁকে আলোচনার অঙ্গ হিসেবেই গণ্য করলেন না। ষাটের দশকের এক হাংরি কবি দেবী রায় একবার এক বেতার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— তাঁদের সময় কয়েকজন কথাসাহিত্যিক থাকলে তাঁরা হাংরি হতেন না। আর এই কথাসাহিত্যিকদের দলে যে নামটি তিনি অবশ্য উল্লেখ করেছিলেন তিনি হলেন কমলকুমার মজুমদার। (করলাভ্যালি পত্রিকা, কমলকুমার সংখ্যা, ২০১৪, পৃ. ২৯)

অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের কথাসাহিত্যে উঠে এসেছিল মহাশ্বেতা দেবীর আগেই। জগদীশ গুপ্ত বলেছিলেন তাঁদের কথা, সেই সঙ্গে কমলকুমার বিশ্লেষণ করেছিলেন তাদের জীবনচর্যা। কমলকুমারের সাহিত্যে তারা করুণার পাত্র হয়ে ওঠেনি, তাদেরই একজন হয়ে কমলকুমার বুঝে নিতে চেয়েছিলেন পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থাকে। নিজের পারিবারিক সূত্রে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন রিখিয়ার বাসিন্দা। ফলে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন এই অন্ত্যজ সমাজের মানুষগুলিকে। তাদের জীবন, পেশা, সংস্কৃতি, দারিদ্র্য— সবকিছুই তিনি অনুধাবন করতে পারতেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে নির্ভর করে। আর তাই তাঁর লেখায় একাধিকবার আমরা অন্ত্যজ ও প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের পেয়েছি। যাদের মধ্যে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসের বৈজুনাথ, ‘পিঞ্জরে বসিয়া শুক’-এ সুঘরাই, ‘সুহাসিনীর পমেটম’-এর লখাই বা ‘শবরীমঙ্গল’-এর মাধালি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু কমলকুমারের গল্প জুড়ে রয়েছে এমন অজস্র চরিত্র যারা অন্ত্যজ নয়, কিন্তু প্রান্তিক। সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত ও লাঞ্চিত যারা, তারা বারবার তাঁর সাহিত্যে ফিরে ফিরে এসেছে। বলা ভালো, তিনি ফিরিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন।

কমলকুমারের সাহিত্যে আমরা পেয়েছি রাজনীতির কথা। খুব অল্প সময়ের জন্য এবং খুব স্বল্প সংখ্যক হলেও তিনি রাজনীতিকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাননি। ‘জল’, ‘তেইশ’ এবং ‘কয়েদখানা’ নামের তিনটি গল্পে তিনি সরাসরি তুলে ধরেছিলেন রাজনৈতিক পটভূমিকে। কৃষক আন্দোলনই হয়েছিল তাঁর গল্পের পটভূমি। এই গল্পগুলির প্রতিটি চরিত্রই কৃষক এবং তারা কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির শিকার— তাই নিয়েই খানিক ব্যঙ্গ, খানিক তীব্র-ভাষণে সমাজের মাথাদের বিদ্ধ করেছিলেন তিনি—

“যে মানুষদের তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন মনে রাখতে হবে তারা ‘অতীব সরল’, ‘অতীব গ্রাম্য’। এ সরল মানুষেরাই তাঁর ভাবনার বিষয়, সাধারণ মানুষেরা নয়। সাধারণ মানুষ ওপর থেকে পাওয়া সংস্কার এবং সংস্কৃতির ফসল, তাদের সাজপোশাক বানানো, ভাবভঙ্গি বানানো, এমনকি রাগ, অনুরাগ, স্বপ্নও বানানো।” (‘কমলকুমার মজুমদারের মানুষ ও ভাষা’, আলোক সরকার, সমতট প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪০-৪১)

ফলে এই মানুষগুলিকে বারবার নানা ছাঁচে ঢেলে পরখ করে নিয়েছিলেন তিনি। ‘জল’ গল্পের কৃষক যতটা বোকা, সরল প্রকৃতির, ‘তেইশ’-এ তা নয়। আবার ‘কয়েদখানা’ গল্পে সেই কৃষক সমাজের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে তিনি বিষয় করে তুলেছেন। অর্থাৎ তাঁর লেখার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রদের যে ক্রম রূপান্তর তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে নানাভাবে।

এই মানুষগুলিকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েই তাঁর লেখায় উঠে এসেছিল একাধিক দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব কখনো শ্রেণির, কখনো মানসিকতার, কখনো বিশ্বাসের আবার কখনো নৈতিকতার দ্বন্দ্ব। তাঁর লেখায় আমরা শুধুমাত্র দুটি শ্রেণিকেই পাই, যথা— উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত। ফলে বৈপরীত্যগুলি ভীষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে শুধু বিত্তের নিরিখে বিভাজন করেননি তিনি, সম্প্রদায়গত বিভাজনও দেখিয়েছিলেন তাঁর কথাসাহিত্যে। উঠে এসেছিল লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যও। সমাজে নারীর অবস্থানকে নিয়ে তাঁর দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছিল তাঁর লেখাগুলির মধ্যে। তিনি বারবার নানা ছাঁচে ঢেলে পরীক্ষা করেছিলেন নারীচরিত্রকে। তাই হয়তো কমলকুমার মজুমদারের লেখায় নারীর চিরায়ত রূপের দেখা মেলেনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার আচরণ সমাজ-বিরুদ্ধ।

‘অন্তর্জলী যাত্রা’ তাঁকে কাক্ষিত সাফল্য এনে দিলেও তাঁর বেশিরভাগ রচনাই দুর্বোধ্যতার অজুহাতে পাঠকের দৃষ্টির বাইরেই রয়ে যায়। কিন্তু চিত্রনাট্য রচয়িতা বা নাট্যনির্দেশক বা চিত্রশিল্পী কমলকুমারের লেখার চিত্রময়তা শুধু “আলো ক্রমে আসিতেছে” দিয়ে কি বিচার্য হতে পারে? কমলকুমারের লেখার এই চিত্রময়তা-কেন্দ্রিক আলোচনা আবদ্ধ হয়ে থাকে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’কে কেন্দ্র করেই। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় তাঁর গল্পগুলি, বিশেষত ‘মল্লিকা বাহার’, ‘প্রেম’, ‘জল’ বা ‘রুশ্বিনীকুমার’ এও এই চিত্রকল্পের

আভাস রয়েছে। সেই কারণেই কমলকুমারের গল্প বা উপন্যাসকে কেন্দ্র করে নির্মিত একাধিক চলচ্চিত্র নির্মাতারা খুব বেশি পরিবর্তনের পথে হাঁটেননি। যে cinematic vision কমলকুমারের লেখায় ছিল, তাকে ব্যবহার করেই নির্মাণ করেছেন জাতীয় স্তরের চলচ্চিত্র। তবে বলতে দ্বিধা হয় না যে এই চলচ্চিত্রগুলির দৌলতেও কমলকুমার খানিকটা বাঙালির কাছে পরিচিত হয়েছেন। সরাসরি কমলকুমার মজুমদারের গল্প না জানলেও গৌতম ঘোষ পরিচালিত ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ সিনেমাটি বা অপর্ণা সেন পরিচালিত ‘সতী’, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ‘তাহাদের কথা’ কমলকুমারকে না হলেও কমলকুমারের গল্পগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গেছে।